কালের কণ্ঠ

তারিখ 17 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শিক্ষক এমপিওতে জালিয়াতি

শরীফুল আলম সুমন ▷

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (জুনিয়র স্কুল) সর্বোচ্চ এমপিওভুক্তির বিধান রয়েছে পাঁচজন শিক্ষক ও দুজন কর্মচারীর। কিন্তু মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাজীপুর মাথাভাঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নিয়ম ভেঙে এরই মধ্যে ১৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হয়েছেন। আরো চারজন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। অতিরিক্ত শ্রেণি শাখার জাল কাগজ আর আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে এই এমপিওভুক্ত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অস্বাভাবিক এই এমপিওর বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্টদের নিয়ে শুনানির আয়োজন করে। এতেও কেউ সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগ পর্যন্ত এমপিওভুক্ত সব শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাউশি অধিদপ্তর।

জুনিয়র স্কুলেও ১৩ জনের এমপিওভুক্তি

জানা যায়, আদালতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তর ছয়টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এমপিওভুক্ত করে। এর মধ্যে মেহেরপুরের কাজীপুর মাথাভাঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় একটি। গত মার্চ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই বিদ্যালয়ের ১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওর জন্য আবেদন করেন। গত জুলাই মাসে খুলনার আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয় ১৩ জনকে এমপিওভুক্তি করে। পরে শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির এই তথ্য মাউশি অধিদপ্তরের কম্পিউটার সেকশনে দেখে তারা অবাক হয়ে যায়। কারণ কোনো জুনিয়র স্কুলেই ১৩ জনের এমপিওভুক্তি নেই। এরপর ১০ আগস্ট আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়ের উপপরিচালক, জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

শিক্ষক এমপিওতে জালিয়াতি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

গতকালের শুনানিতে কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।

জানা যায়, শুনানিতে মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান নানা চেষ্টায় এই অদ্ভুত জালিয়াতির তথ্য বের করতে না পেরে প্রধান শিক্ষককে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিতে ভয় দেখান। এতে প্রধান শিক্ষক মো. কামাল হোসেন ৫০ হাজার টাকার মাধ্যমে যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলার অনুমতি এনেছেন বলে স্বীকার করেন।

মাউশি অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'এই ১৩ জনের এমপিওভুক্তিতে ৩০ থেকে ৪০ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। কারণ অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলার যে কাগজ দেখানো হয়েছে তা সঠিক নয়। দেখানো হয়েছে ২০০২ সালে অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলার অনুমোদন দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এরপর ২০০৫ সালে দেয় যশোর বোর্ড। অথচ আগে দেওয়ার কথা বোর্ডের, এরপর মন্ত্রণালয়ের। প্রতিটি ক্লাসেই তিনটি সেকশন দেখানো হয়েছে। গ্রামের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে এত শিক্ষার্থী কোত্থেকে আসবে? আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, একটি সেকশনের শিক্ষার্থীই তাদের নেই। আসলে আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের যোগসাজশেই এই অবৈধ এমপিও হয়েছে।'

খুলনা আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের উপপরিচালক টি এম জাকির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের কাছে অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলার কাগজ দিয়েছে, তাই আমরা এমপিও দিয়েছি। তবে এ জন্য কোনো টাকা-পয়সা নেওয়া হয়নি। এখন যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, তাদের বেতন বন্ধ করা হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের এমপিও বাতিল করে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

একজন শিক্ষককে এমপিওভুক্তি হতে হলে তিনটি হাত ঘুরতে হয়। প্রথমে আবেদন যায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কাছে। তিনিই মূলত পদ আছে কি না তা দেখেন। এরপর জেলা শিক্ষা অফিসার হয়ে তা চলে যায় আঞ্চলিক কার্যালয়ে। তাঁরা যাচাই বাছাইয়ের পর এমপিও দেন। কিন্তু একটি জুনিয়র স্কুলে এমপিওর জন্য ১৭ জনের আবেদন এলেও তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেননি, এমনকি ১৩ জনকে এমপিওভুক্তিও করা হয়।

ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. কামাল হোসেন বলেন, 'আমাদের শিক্ষার্থী অনেক তাই শিক্ষকের সংখ্যা বেশি।' কত টাকা লেনদেনের মাধ্যমে এই এমপিও পেয়েছেন তা জানতে চাইলে তিনি পরে কথা বলবেন বলে ফোন কেটে দেন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার বলেন, 'আমরা কাগজপত্রের ভিত্তিতে এমপিওভুক্তি দিয়েছি। এখন যদি এটাকে দুর্নীতি বলা হয় তাহলে এর ভাগিদার এই কাজের সঙ্গে জড়িত সবাই। এমনকি শিক্ষা বোর্ডও।' অভিযোগ রয়েছে, যেহেতু পদ সৃষ্টির দায়িত্ব উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের; তিনি জেনেশুনেই একটি জুনিয়র স্কুলে এত অধিকসংখ্যক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেছেন। এরপর খুলনার উপপরিচালক টি এম জাকির হোসেনও জেনেশুনেই এই এমপিও দিয়েছেন।

মাউশি অধিদপ্তরের উপপরিচালক এ কে মোস্তফা কামাল (মাধ্যমিক) বলেন, 'টপ টু বটম দুর্নীতি না করলে একটি জুনিয়র স্কুলে এত শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও পেতে পারেন না।'